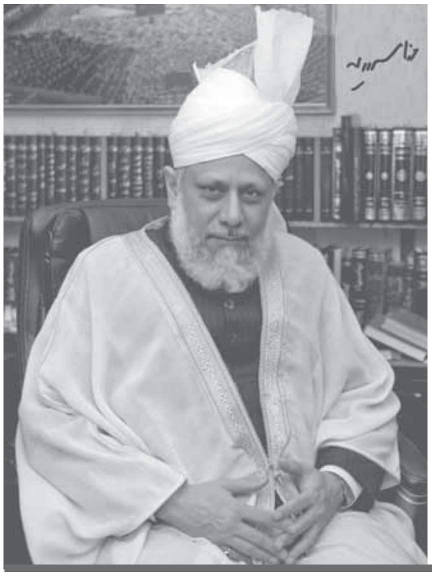

খুতবা ঈদুল আযহা

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ১৭ নভেম্বর ২০১০ তারিখে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে খুতবা ঈদুল আযহা এরশাদ করেছেন।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمين * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ آمين

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۳﴾ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿۱۰۴﴾ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿۱۰۵﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ج اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۰۶﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿۱۰۷﴾ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۸﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿۱۰۹﴾

অর্থাৎ এরপর যখন তার সাথে দৌড়াদৌড়ি করার বয়সে পৌঁছলো সে বলল, হে আমার প্রিয় পুত্র! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখে থাকি আমি তোমাকে জবাই করছি। অতএব চিন্তা কর (এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কী? সে বললো, হে আমার পিতা! তোমাকে যা আদেশ দেয়া হচ্ছে তুমি তা-ই কর। আল্লাহ্ চাইলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবে।

আজ আমরা ঈদুল আযহা উদযাপন করছি। এ ঈদ কুরবানীর ঈদ। ঐ কুরবানীর স্মরণের ঈদ যা আজ থেকে চার হাজার বছর পূর্বে কুরবানীর নতুন মাত্রা যোগ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলার দু'জন বুযুর্গ নবী পেশ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা ঐ সময় একটি মস্তক (মাথা) আল্লাহ্‌র পথে কর্তন করতে বাধা দিয়ে বলেছিলেন–"তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছ" এবং মস্তক কর্তনের কুরবানী গৃহিত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ঐ একটি মস্তক কর্তনের বদলে আল্লাহ্ তাআলা এক মহিমান্বিত জবাহ'-এর নমুনা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন। এমন মহান জবেহ'- যার মাত্রা এক মস্তক কর্তনের চেয়েও অনেক বড় মাত্রা ছুঁতে যাচ্ছিল। যখন সেই মহানবী (সা.) জন্মগ্রহণ করবেন, যিনি না কেবল নিজে সারাক্ষণ নিজ প্রাণ কুরবান করতে প্রস্তুত থাকবেন, বরং তাঁর অনুসরণকারীদের মধ্যেও এমন রূহ, এমন প্রাণ সৃষ্টি করবেন যারা সারাক্ষণ কুরবানীর নব নব উদাহরণ সৃষ্টি করতে থাকবে। তারপর আকাশে বসবাসকারীরা দেখেছেন কত চমৎকার কুরবানীর অপূর্ব রং তারা সৃষ্টি করে চলেছেন। কুরবানীর আশ্চর্য আশ্চর্য উদাহরণ সৃষ্টি করে চলেছেন। কুরবানীর ময়দানে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টায় রত থাকছেন। আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবায়ে কেরাম কুরবানীর সময় চিন্তা করতেন যে আল্লাহ্ তাআলা এ আমলে সন্তুষ্ট হবেন তো! ধৈর্য এবং সহনশীলতার কুরবানী দিতে তাঁরা তাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর নমুনার উপর চলতে সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকতেন।

যখন অর্থ সম্পদ কুরবানীর সময় এসেছে তখন আঁ হযরত (সা.) তরবীয়ত প্রাপ্ত সাহাবা এই কুরবানীতে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে থাকতে চেষ্টা করেছেন। যখন প্রাণ কুরবান করার সময় এসেছে তখন তারা এমন উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন যে মানুষ হতবাক হয়ে যায়। তাদের প্রাণের কুরবানীর উৎসাহকে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরীফে এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন (সূরা তওবা : ৯২)

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ص تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿۹۲﴾

আজ আহমদীয়া জামা'তই রয়েছে যারা একশত বিশ বছর ধরে নিজেদের জান, মাল ও ইজ্জত কুরবান করে যাচ্ছেন। আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাস প্রাণ উৎসর্গের সেই কুরবানীকে কখনও ভুলতে পারে না, যা সাহেবযাদা হযরত আব্দুল লতীফ সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই দিয়েছিলেন।

তাদের ভারাক্রান্ত হৃদয় থেকে তাদের চোখ দিয়ে (অশ্রু) ঝরে যে তাদের হাতে খরচ করার মত কিছু নাই। এখানে কেবল মাল খরচের কথা নয়। বরং আল্লাহ্‌র পথে জেহাদের কথা বলা হয়েছে। তখন অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, দীর্ঘ পথ সফরের জন্য যে যানবাহনের প্রয়োজন ছিল তা তাদের ছিল না। গরীব ছিলেন তারা। দারিদ্র এতটা ছিল যে সফরের জন্য জুতাও ছিল না। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তাদের চাহিদা ছিল, আমাদের জুতা দেয়া হলে আমরা এই দীর্ঘ সফর পায়ে হেঁটেই যাত্রা করতাম। সফরের জন্য আমরা ঘোড়া বা উট চাচ্ছি না, আমরা জুতা চাচ্ছি যেন আমরা হেঁটেই সফর করতে পারি।

তারা জান প্রাণ কুরবান করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু (প্রাণ দিতে যুদ্ধের ময়দানে যেতে) দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু ঐ যুগে অবস্থা এমন ছিল যে, ঘোড়া বা উট তো দূরের কথা জুতাও ছিল না। আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, এরা নিশ্চয় পাকা মু'মিন ছিলেন যারা কুরবানী করার জন্য উৎসুক ছিলেন। যখন তাদেরকে অস্বীকার করা হলো যে, জামা'তের তরফ থেকে আমরা তোমাদের জন্য জুতাও সরবরাহ করতে পারছি না, কোন যানবাহন যোগাড়ের তো প্রশ্নই উঠে না। নিজেরা ব্যবস্থা করতে পারলে কর। এ কথায় তাদের চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল যে, হায়! আমাদের জন্য যদি সম্ভব হতো তাহলে আমরা দেখাতে পারতাম যে, আমরা কুরবানী দিতে ভীত নই। জান-মাল সবই তো আল্লাহ্‌র।

আমরা তো কুরবানী দিতে প্রস্তুত! সর্বক্ষণ কুরবানীর জন্য উৎসাহিত, তারপর যখন সুযোগ এসেছিল তখন প্রমাণ করেছিলেন যে তারা ভুল বলেন নি, তারা বাহানা করার মত ছিলেন না। সুতরাং তারা কুরবানীর ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দিয়ে ঐ মর্যাদা লাভ করেছিলেন যার সার্টিফিকেট আল্লাহ্ তাআলা **'রাযিআল্লাহো আনহুম'** বলে প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ– আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

অতএব হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) "স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছেন" বলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন যার ফলে তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে একজন মহানবী (সা.) **'জাবহে আযীমে'র** এমন মহান উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এমন উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন, যে তাঁর (সা.)-এর মান্যকারীরাও কুরবানীর এমন মাত্রা সৃষ্টি করেছেন যে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে **'রাযি আল্লাহু আনহুম'**-এর সম্মানে ভূষিত করেছেন। সুতরাং ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার এই ফসল যা কুরবানীর মাত্রা সৃষ্টি করে ফলতে শুরু করেছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের ঐ কুরবানীর বিনিময়ে জাগতিক সাজ-সজ্জাও প্রদান করেছিলেন।

দেশও দিয়েছেন, শাসন ক্ষমতাও দিয়েছেন। আজ আমরা যদি দৃষ্টি দেই তাহলে দেখব নি:সন্দেহে কতক মুসলমান দেশে জাতিগত সম্পদ তো আছে কিন্তু খোদা তাআলার সন্তুষ্টির সেই পদমর্যাদা দৃষ্টিগোচর হয় না যাতে খোদা তাআলার নৈকট্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। তারপর সম্পদ থাকা সত্বেও (তারা) অমুসলিম দেশের ইংগিতে চলে।

আল্লাহ্ তাআলা এই ঈদ প্রত্যেক আহমদীর জন্য সর্বদিক থেকে কল্যাণমন্ডিত করুন।

সেই মুসলমান যারা নিজেদের কুরবানীর ফলে পৃথিবীকে খোদা তাআলার ইবাদতকারীতে পরিণত করেছিল, ইউরোপে মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা উড্ডীন করেছিল, তারা যখন কুরবানীর মানকে ভুলে গেল তখন কতক দেশও তাদের হাতছাড়া হয়। হৃদয় যখন ইসলাম প্রচারের পরিবর্তে লোভ লালসার আকাঙ্খি তখন রাজাও দুর্বল হয়ে গেল আর সম্মানও চলে গেল।

বর্তমানে মুসলমান দেশগুলোতে সেই পদমর্যাদা এবং সম্মান প্রতিষ্ঠিত নেই, শেষ পর্যন্ত সব কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হল। এখন প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুসলমানদের মধ্য হতে যখন কোন শক্তির সম্মুখে আসার চেষ্টা করে আর নিজেদের ধারনায় ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাও আবার এমন ভাবে তরবিয়ত বিহীন লোকদের দ্বারা যারা ইসলামের নামকে উজ্জ্বল করার পরিবর্তে নিজেদের সন্ত্রাসি চিন্তা চেতনার কারণে অমুসলিম জগতে ইসলামকেই কলঙ্কিত করছে। এছাড়া নিজেদের নিস্পাপ মুসলমানদের নির্দয়ভাবে হত্যা, ধ্বংস এবং লুট-পাট করে শেষ করে দিচ্ছে।

তাই মুসলমান আলেম এবং দেশের শাসকদের নিজেদের চিন্তাকে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এ হজ্জের অনুষ্ঠানে সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় মুফতী নিজের বক্তৃতায় সম্পূর্ণ সত্য বলেছেন, ইনসাফের শূন্যতার কারণে ঔদ্ধত্য জন্ম নেয়। মুসলমান শাসকগণ যদি জন সাধারণের অধিকারের দিকে দৃষ্টি না দেয় তা হলে এ ঔদ্ধত্য সৃষ্টি হবে। তিনি (মুফতী সাহেব) যথার্থ বলেছেন, মুসলমানদের রক্তক্ষরণ করা হচ্ছে অথচ ইসলামে সন্ত্রাসের কোন সুযোগ নেই। তিনি এটি সঠিক বলেছেন, অন্যান্য জাতিসমূহ মুসলমানদেরকে (নিজেদের মধ্যে) লড়াতে চায়, তিনি এ ঠিক কথাই বলেছেন, মুসলমানদের মাঝে ঐক্য আবশ্যক। তবে তিনি ও অন্যান্য মুসলমান উলামা এবং নেতাগণ এ বিষয়টিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন যে, এ যুগে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে অস্তিত্বকে খোদা তাআলা পাঠিয়েছেন তাঁর আজ্ঞা পালনে মাথা অবনত করে রাখবে। আজ্ঞাবহ হয়ে মুসলমান নিজেদের সম্মান পুন:প্রতিষ্ঠা করুক, মসীহ্ এবং মাহ্দীর হাতে সমবেত হয়ে এক উম্মতের দৃশ্য উপস্থাপন করুক।

আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক হয়ে কুরবানীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করুক।মুহাম্মদী মসীহ্‌র সাথে সংযুক্ত হয়ে নিজের আধ্যাত্মিক মর্যাদা বৃদ্ধি করুক যা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির কারণ হবে। সুতরাং আজ যদি হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর সেই ধারাবাহিকতাকে জারী রাখতে হয় যা সেই **'যিবহে আযীম'** (মহাকুরবানী)-এর মর্যাদায় পৌঁছে ছিল যা প্রত্যেক ধরণের কুরবানীর পদমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। তাই সেই মহান নবীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যায়নে আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াও আবশ্যক। মুসলমানগণ যদি একতাবদ্ধ হয়ে যুগের ইমামের বিরোধিতার পরিবর্তে এক হাতে একত্রিত হয়ে (তাঁর হাতকে) দৃঢ়কারী হয়ে যায় তাহলে তারা জগতে সেই দৃশ্য প্রদর্শনকারী হয়ে যাবেন যার ফলে জগত পুণরায় মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য

দেখবে, ইনশাআল্লাহ্।

আজ কোন মুফতি আর আলেমের ওয়াজ মুসলমানদের একত্রিত করতে সহায়ক হবে না, কোন বাদশাহ-এর তেলের সম্পদ মুসলমানদের এক হাতে একত্রিত করতে পারবে না, আর না সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করে প্রথম যুগের কুরবানীর পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। তবে কিছু মানুষ এমন আছে যারা কয়েক দিন ওয়াজের প্রশংসা করে এবং এর উপর আমল করার আবশ্যকতায় গুরুত্ব দিবে। সম্পদের মাধ্যমে বাদশাহ এবং শাসকগণ নিজেদের স্বার্থ অবশ্যই অর্জন করতে পারে। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনসমূহ দরিদ্র, ক্ষুধা এবং নি:স্ব পরিবারের সন্তানদের ভুল পদ্ধতিতে ধর্মের নামে ব্যবহার করে তাদের মগজ ধোলাই করে কুরবানীর নামে আত্মঘাতি হামলায় অবশ্যই ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু যখন মগজ ধোলাইকৃত সেই সন্তানদের ঐ অবস্থা থেকে বের করে নিয়ে আসা হয় তখন তারা আত্মরক্ষার চেষ্টায় লেগে যায় যার সুস্পষ্ট করে যে এই আত্মঘাতি হামলা তাদের হৃদয়ের আওয়াজ নয়। আর এমন কয়েকজন ছেলে দৃশ্যপটে এসেছে যাদের পুলিশ গ্রেফতারের প্রেক্ষিতে তারা এমনই বিবৃতি দিয়েছে। তাই এ সন্তানদের মাঝে যখন চিন্তা চেতনা জাগ্রত হয় তখন তাদের চিন্তার ধরনই পাল্টে যায়।

এখন যাচাই করে দেখুন! অধিকাংশ আত্মঘাতি আক্রমণকারী সন্তান হচ্ছে সে সব সন্তান, যাদের নিজেদের কোন চিন্তা শক্তি নেই। পাকা চিন্তা-চেতনার অধিকারীকে সাধারণত কখনো আপনি আক্রমণে সম্পৃক্ত দেখবেন না। চিন্তা-চেতনার সাথে কুরবানী তো ঐ দুই সন্তান- **মায এবং মোয়া'বেয**-এর ছিল যারা চিতার ন্যায় শত্রুর মাঝে ঢুকে আবু জাহেলকে নির্মম পরিণামে পৌঁছিয়েছিল। তবে সেই জীবন উৎসর্গকারীগণ নিজের ধর্মকে রক্ষা আর শত্রুদের আক্রমণের প্রতি উত্তরের জন্য যুদ্ধের ময়দানে যেতেন।

নতুবা ধৈর্য এবং সন্তুষ্টির সাথে কষ্ট সহ্যের যুগ কোন স্বল্প মেয়াদী সময়ের ছিল না। অতএব আজ কোন্ ইসলামী যুদ্ধ চলছে? যা প্রতিহত করার জন্য এরা আক্রমণ করছে। আবার আক্রমণও নিজেরই মুসলমান দেশে বসবাসকারীদের উপর দেশীয় আইন পদদলিত করে। সুতরাং তথাকথিত এ কুরবানী সমূহ খোদার দরবারে গৃহীত কুরবানী নয়। সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় মুফতী ঠিকই বলেছেন, আমাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক।

হায়! (যদি) তিনি এটিও বলে দিতেন, এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত কারো খোঁজ কর, পৃথিবী এবং আকাশের নিদর্শন সমূহ অবলোকন করে এ ঘোষণাও করে দিতেন যে, যদিও নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান আছে আর প্রকাশিতও হচ্ছে তবে দাবী কারকের ব্যাপারে আমাদের কিছু সতর্কতা (অবলম্বন করতে হবে) আছে। আসুন এ হজ্জের সময় বিশেষ করে যারা হজ্জকারী আর সাধারণত মুসলমান উম্মত, এ দোয়া করি হে খোদা! যদি এ দাবীকারক সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সত্য থেকে বঞ্চিত করো না।

আমাদেরকে পথ দেখাও যেন আমরা তোমার সেই বাণীকে যা তুমি আঁ হযরত (সা.) এর মাধ্যমে দিয়েছ তাঁকে গ্রহণ করে তোমার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি। যদি আন্তরিকতার সাথে এবং নেক নিয়তে এই দোয়া করেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা পথ দেখাবেন, ইনশাআল্লাহ। আর এই মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর বয়আত গ্রহণ করে তারা জিহাদের প্রকৃত মর্মও জানতে পারবে। কুরবানীর বিভিন্ন মান সম্পর্কেও ধারণা সৃষ্টি হবে।

আর এই যুগে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর **'আহমদ'** বৈশিষ্ট সম্পর্কে অবহিত হবে। কেননা এ যুগে মুহাম্মদ (সা.)-এর **'আহমদ'** বৈশিষ্টই দুনিয়াতে এক বিপ্লব আনয়ন করবে। যে বিপ্লব পুরো বিশ্বকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুগত করে দিবে। নম্রতা, বিনয়, ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে ইসলামের পতাকাতলে একত্র করবে। অতএব আজ এটি আল্লাহ্ তাআলার অটল তকদীর, আজ এই কাজ যুগ ইমাম, মুহাম্মদী মসীহ এবং তার দাসেরাই সম্পন্ন করবে। ধৈর্য, দোয়া ও কুরবানীর প্রকৃত তত্ত্ব বুঝে, কুরবানীর উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করে এ কাজ সম্পন্ন করবে।

আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস এই ধৈর্য, দোয়া এবং কুরবানীর উন্নত মান আমাদেরকে দেখায়। কুরবানীর মান কখনও আত্মঘাতী হামলা করে নিজেকে উড়িয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না। অথবা বিশ্ববাসীকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে আত্মঘাতী হামলাকে প্রাণউৎসর্গের নাম দিয়ে অর্জিত হয় না। বরং কুরবানীর মান তো সেই ধৈর্য, তুষ্টি ও আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয় যা আল্লাহ তাআলার প্রেরিত তার অনুসারীদের সামনে পেশ করেন।

তিনি যে বাণী সামনে উপস্থাপন করেন তার আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যখন আঁ হযরত (সা.) উম্মতকে মুহাম্মদী মসীহর যুগের জন্য **ইয়াযাউল হারব**-এর শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন তখন এর পূর্ণ আনুগত্য করাই প্রকৃত ঈমানের পরিচয়।

সুতরাং আজ আহমদীয়া জামাতই রয়েছে যারা একশত বিশ বছর ধরে নিজেদের জান, মাল ও ইজ্জত কুরবান করে যাচ্ছেন। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস প্রাণ উৎসর্গের সেই কুরবানীকে কখনও ভুলতে পারে না, যা সাহেবযাদা হযরত আব্দুল লতীফ সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন ধরণের লোভ লালসা ও বেশ কিছুদিন চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ থাকা সত্বেও তিনি চরম ধৈর্য ও তুষ্টির সাথে অত্যাচারিদের পাথর বর্ষণের সময় নিজের ঈমানের বহিঃপ্রকাশ করতঃ প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছেন। যার সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কামেল বিশ্বাসের আদর্শ সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ দেখিয়ে দিয়েছেন, প্রাণ বিসর্জনের চেয়ে বড় আর কোন জিনিস নেই। আর এমন দৃঢ়তার সাথে প্রাণ বিসর্জন দেয়া স্পষ্ট ঘোষণা করছে, তিনি আমাকে আকাশ হতে অবতরণ করতে দেখেছেন।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, মরহুম শহীদ প্রাণ দিয়ে আমার জামাতকে একটি নমুনা বা আদর্শ দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে আমার জামাত একটি বড় নমুনা বা আদর্শের মুখাপেক্ষী ছিল। অতএব যুগ ইমাম যার কুরবানীকে একটি আদর্শ আখ্যা দিয়ে দিয়েছেন তা আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস থেকে কখনও মুছে যেতে পারে না। হ্যাঁ, এই আদর্শকে সামনে রেখে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামাতের পরবর্তী আগমনকারী সদস্যগণ, তারা কুরবানীর মান সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টায় জীবনকে উৎসর্গ করে আর আজ পর্যন্ত তা করে আসছে।

এ বছর অর্থাৎ ২০১০ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতাকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে মান্য করে তার মান্যকারীদের

মধ্য থেকে ৯৮ জন নিজেদের জীবনের নজরানা পেশ করেছেন। এবং উক্ত নযরানা উপস্থাপন করে জগতকে বলে গেছেন, আমরা কুরবানীর এমন মান প্রতিষ্ঠাকারী যার মূল সেই আত্মা থেকে উৎসারিত হচ্ছে যে রূহ হযরত রাসূলে পাক (সা.) নিজ সাহাবীদের মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং যার মূল এতটা গভীরে বরং হযরত ইব্রাহীম এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সে মূলকে শত্রুর বিরোধিতার ঝড় কিভাবে হেলাতে পারে? মসীহ্ মাহদী যে চারাগাছ লাগিয়েছিলেন আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় তা আজ এক বড় বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। যার ডালপালা জগতের মহাদেশসমূহের ১৯৮টি দেশে বিস্তৃত হয়ে গেছে। এ বৃক্ষকে বিরোধিতার ঝড় কিভাবে দোলাতে পারে। আমরা জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাসে এটিই দেখেছি যে, প্রত্যেক কুরবানী, প্রত্যেক বিরোধিতা নতুন ফলাফল বয়ে আনে এবং অতীতের তুলনায় অত্যধিক ফল বয়ে আনে।

আজ পর্যন্ত জামাতের কুরবানীসমূহ, কুরবানীর ইতিহাসে এ বছরের পূর্বে ৭৪ সালে সবচেয়ে বেশি শাহাদত বরণ করেছিল যার সংখ্যা প্রায় ৩০ জন। কিন্তু ৭৪ সালের পর জামা'ত যতটা বৃদ্ধি লাভ করেছে ইতিপূর্বে এর কোন উপমা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর্থিকভাবে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন, তাদের আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক ভাল হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাআলার কল্যাণরাজী দেখে স্বয়ং কুরবানীকারীরা অবাক হয়েছে যে খোদা তাআলা কিভাকে নিজে কুদরতের নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন।

এরপর ৮৪ সালের জঘন্য অর্ডিনেন্স যাতে ৭৪ সালের জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্তের ওপর ভর করে আরও বাড়তি কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। আহমদীদের জীবন যাপন অতিষ্ঠ করে দেয়া হয়েছে। কারাগারগুলো আহমদীদের মাধ্যমে ভরে ফেলা হয়েছিল যে আহমদীরা কাউকে সালাম পর্যন্ত দিতে পারত না বরং মুসলিম নামও রাখতে পারত না।

যুগ খলীফাকে পাকিস্তান থেকে চলে যেতে হয়েছে তখন আল্লাহ্ তাআলা জামাতের প্রসারে সেই রাস্তা খুলে দিয়েছেন যা পূর্বে চিন্তাই করা যেত না। আর এ বিধানের ফলে দুনিয়ার সামনে আহমদীয়াত পরিচিতি লাভ করেছে। আজও উক্ত বিধান পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে। আহমদীরা উক্ত সমস্যার মোকাবিলা করছে। বিভিন্ন সময়ে যখনই সরকারের মাথায় এই চিন্তা আসে তারা আহমদীদের উপর উক্ত বিধানের কারণে কাঠিণ্যের সৃষ্টি করে।

যাহোক এ সংবিধানের কারণে যে সকল আহমদী আজ পাকিস্তানে বসবাস করছেন তারা পুণরায় ধারাবাহিকভাবে কুরবানীর মান সমুন্নত রেখে চলেছেন যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, সরকারী ব্যবস্থাপকগণ যেভাবে পারছে বরং মৌলবীদের মাধ্যমেও আহমদীদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করা হয়।

ইত্যবসরে জামাত যে আত্মত্যাগ করেছে তা কোন সাধারণ ত্যাগ নয়। আর আল্ল?াহ্ তাআলার অনুগ্রহের ধরণও এমন যা অপরিমেয়। শত্রুরা বলে, নিবৃত্ত হও এবং আহমদীয়াত থেকে তওবা কর অন্যথায় অমুকটা করব, তমুকটা করব। যেভাবে আমি বলেছি, আহমদীরা তাদের অত্যাচারের শিকার হয়ে আত্মোৎসর্গ পর্যন্ত করেছেন এবং শাহাদতের মর্যাদা লাভা করেছেন। কিন্তু কোন একজনের স্বজনও দুর্বলতা দেখিয়ে শত্রুর সম্মুখে নতি স্বীকার করে নি, প্রাণ ভিক্ষা চায় নি এবং আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা পেতে ক্ষমা ভিক্ষা চায় নি। তারা ধৈর্য ও দৃঢ়তার এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

সম্প্রতি মার্দানে জনাব শেখ মাহমুদ সাহেবকে শহীদ করা হয়েছে এবং তার স্নেহাস্পদ ছেলে আরিফ মাহমুদ আহত হয়েছে। যেভাবে আমি জুমুআর খুতবাতেও বলেছি, নাযের উমরে আমা যখন আহত এ যুবকের সাথে ফোনে কথা বলেছেন তখন সে তাকে বলেছেন, আহত হওয়া সত্ত্বেও আমি মনোবল হারাই নি এবং কেউ আমাকে আমার ঈমান থেকেও টলাতে পারবে না; ইন্‌শাআল্লাহ্।

অতএব যে জাতির মাঝে এমন আত্মোৎসর্গকারী রয়েছে, এমন যুবক রয়েছে যারা মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে কথা বলে তাদেরকে মৃত্যুর ভয়ে ভীত করা কিভাবে সম্ভব? এ দৃঢ় বিশ্বাসের জন্যই তাদের মাঝে এ ঈমান সৃষ্টি হয়েছে যে, **নিশ্চিতরূপে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী।** আর আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি এখন এতেই নিহিত যে, এই মসীহ্ ও মাহদীর সাথে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই যেন তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হয় এবং তাঁর কৃপার অংশীদারিত্ব লাভ হয়।

আল্লাহ্ তাআলার বাণী- **নাহনু আওলিয়ায়ুকুম ফিল হায়াতিদ্ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ-** তাদের হৃদয়কে দৃঢ় করে এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করে। অতএব ইহ জগত ও পর জগতে আল্ল?াহ্ তাআলা যার বন্ধু ও অভিভাবক তখন বিশ্ববাসীকে তার কিসের ভয় এবং কে তাকে আত্মত্যাগে বিরত রাখতে পারে? কাজেই এ যুবক যখন এ কথা বলেছে যে, একটি দুটি গুলি তো কোন বিষয়ই না। বরং আমাকে ঝাঁঝঁরা করে ফেললেও আমি পরওয়া করি না।

অতএব, এমন লোকদের মাঝেই এ ধরনের দৃঢ়তা সৃষ্টি হয় যারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায়। কাজেই, আমরা যখন যুগ ইমামের সাথে অঙ্গিকার ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি তখন তা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশাতেই হয়েছি। এ বাসনাতেই অঙ্গিকার করেছি যে, আল্লাহ্ তাআলার সাথে সুসম্পর্ক গড়তে হবে।

এ কথা জেনেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যে, প্রেম ও বিশ্বস্ততার জমীন রক্ত সিঞ্চন ব্যতীত সজীব হয় না। এ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই অঙ্গিকার করেছি যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- কে বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কেননা আমরা অনেক প্রতিশ্রুতিই পূর্ণ হতে দেখেছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গিকার কোন একটি নির্দিষ্ট যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়।

বা এমন ছিল না যে কিছু প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে আর কিছু হবে না। তিনি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে জ্ঞাত হয়ে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বা আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে যেসব সুসংবাদ দিয়েছেন সেগুলো পূর্ণ হবার জন্যই ছিল। আল্লাহ্ তাআলা কখনো তার প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। তবে তা থেকে অংশ পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশিত পথে চলা আবশ্যক। নিজের মধ্যে আনুগত্য ও কুরবানীর মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটি করতে থাকব, আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য আমাদের সাথে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা বিষয়টির আরো গভীরে গিয়ে দেখলে দেখতে পাই, আল্লাহ্ তাআলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগে ইসলামের পুণর্জাগরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আহমদীয়াতের মাধ্যমে ইসলামের উন্নতি হবে। **'ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহীম'**- আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এটি স্পষ্ট করেছেন।

বরং আমরা আরো চিন্তা করলে ও গভীর দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই, খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার বিষয়ে **'কাদ সাদ্দাকতার্ রুইয়া'** আয়াতের মাধ্যমেই নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এ রুইয়া (সত্যসপ্ন) পূর্ণ করতে শুধু পিতার ভূমিকাই ছিল না, বরং পুত্র তখন বলেছে **'সাতাজেদুনী ইনশাআল্লাহু মিনাস্ সাবেরীন'**। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা যা চেয়েছেন, তাতে নিশ্চয় তুমি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবে।

অতএব, এ ধৈর্যের অঙ্গীকার পরবর্তী বংশধরদের কুরবানীর মান অর্জনের রায়ও দিয়ে দিয়েছে। শুধু প্রাণ বিসর্জন দিলে তাতে কি ধৈর্য প্রকাশ পেত? ধৈর্যের অমূল্য মনিমানিক্য তো তখন উন্মুক্ত হবার ছিল যখন ধারাবাহিক কুরবানীর মান প্রতিষ্ঠিত হবার ছিল। যখন আল্লাহ্ তাআলার খাতিরে কোন অভিযোগ ছাড়াই সর্বপ্রকার কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকবে। আর সেটি সমগ্র জীবন এক জলহীন ও তরুলতাহীন স্থানে শৈশব থেকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর আল্লাহ্ তাআলা যখন বলেছেন, **'ইন্না কাযালিকা নাজযিল মুহসিনীন'** অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা সৎকর্মশীলদের এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। দুজনকেই কুরবানী করতে প্রস্তুত দেখে তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সৎকর্মশীলদের ধারা **'জিবহে আযীম'** (বড় কুরবানী) এর যুগের মাধ্যমে আরম্ভ হবার ছিল।

যখন আল্লাহ্ তাআলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ সৎকর্মশীল সৃষ্টি করলেন, লক্ষ লক্ষ পূণ্যবান সৃষ্টি করলেন, যারা ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। এরপর যেভাবে আমি পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি, পরবর্তীদের যুগ আল্লাহ্ তাআলা এ যুগের সাথে জুড়ে দিয়েছেন যাতে ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা ইব্রাহীম (আ.) এর ঘটনার মাধ্যমে বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **'ওয়া ইবরাহীমুল্লাযী ওয়াফ্‌ফা'** অর্থাৎ ইব্রাহীম যিনি পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন'। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যখন তিনি পুত্রকে কুরবানী করতে প্রস্তুত হলেন তখন এ আওয়ায আসল। অতএব, যখন পিতার বিশ্বস্ততা এবং পুত্রের ধৈর্য একত্রে প্রকাশ পেল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের স্মরণকে জারি রাখার জন্য শুধু হজ্জের ইবাদতই মুসলমানদের মধ্যে চালু করলেন না, বরং এরপর সেই মহান নবীকে এ বংশের মধ্যে আবির্ভূত করলেন যিনি **ফানাফিল্লাহ্** (খোদার মধ্যে বিলীন) হবার একক ও মহান মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত করলেন।

আল্লাহ্ করুন এই ঈদ যেন আমাদের প্রিয়গণের কুরবানীসমূহকে সর্বদা স্মরণ করাতে থাকেন। আর আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত যেন শান্তিতে না বসি যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর পতাকা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত করে প্রেম-প্রীতি, ধৈর্য ও বিশ্বস্ততা এবং আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতকারী পৃথিবীতে অধিক সংখ্যায় না দেখি। আর যখন এরূপ হবে তখনই কেবল আমাদের কুরবানী সমূহের কবুলিয়াতের প্রকৃত ঈদ হবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এই শক্তি সামর্থ্য দান করুন।

যার উল্লেখ কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা এভাবে করেছেন–

'তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন আমার মৃত্যু সবই জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য।' আবার আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এই রাসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শের পথে চল।

কেননা আজ এই আদর্শই তোমাদের মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত করে, তোমাদের ইবাদতের মানদন্ডকে প্রতিষ্ঠিত করে। বরং সমগ্র সৃষ্টি, সব পুণ্য কর্মের মানদন্ড মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে।

সুতরাং যে বিশ্বস্ততা, ধৈর্য ও কুরবানীর মানদন্ড হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর মাঝে এসে সেটার চূড়ান্ত মার্গের পরিসমপ্তি ঘটে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সামনে প্রাথমিক মানদন্ড থেকে নিয়ে চূড়ান্ত মানদন্ড পর্যন্ত তুলে ধরে এ নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদের জন্য জীবনাদর্শ হলো এই চূড়ান্ত মানদন্ড। এই চূড়ান্ত মানদন্ড অর্জনের জন্য রাসূল (সা.)-এর সাহাবাদের মাঝে হাজারো ইসমাঈলের জন্ম হয়েছে। যারা খোদা তাআলার নামকে সমুন্নত করার জন্য, ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাকে জগতে সম্প্রসারণের জন্য নিজেদের শিরোচ্ছেদ করেছেন, জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।

বিশ্বস্ততা ও ধৈর্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। আর যেভাবে আমি বর্ণনা করেছি, আল্লাহ্ তাআলা তাদের ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার কারণে **"রাযিয়াল্লাহু আনহুম"** (আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট) এর সম্মান দান করেছেন। আজ মসীহ্ ও মাহ্দীর সেবকদেরও এটাই কাজ, তারা যেন ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার মূর্তিমান প্রতীক হয়ে যায়। এই বছর যে মসীহ্ ও মাহ্দীর একশত সেবক ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার বহির্প্রকাশ হিসেবে কুরবানী দিয়েছে এটা নিশ্চিত এই বিষয়ের প্রমাণ, আমরা প্রেমপ্রীতি ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে কখনও পিছনে থাকার পাত্র নই। সুতরাং এই কুরবানীকারীরা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করে নিয়েছে কেননা এটা আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি। আমার কাছে যে চিঠিগুলো আসে এটার বহির্প্রকাশ হিসেবে আসে–আমরাও কুরবানী দেয়ার

জন্য প্রস্তুত আছি, আমরাও এই দলের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে–

তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা এখনও প্রতিক্ষায় আছে, কখন সুযোগ আসবে আর তারা নিজেদের নিষ্ঠাপূর্ণ অঙ্গীকার সত্য সাব্যস্ত করে দেখাবে'। সুতরাং এই ঈদ ঐ কুরবানীকারীদের কুরবানীকে স্মরণ রেখে **ওয়া মিনহুম মাই ইয়ানতাজির** এর অঙ্গীকার করার ঈদ। এটা খোদা তাআলা ভাল জানেন, কার নিকট থেকে কেমন কুরবানী নিবেন।

কিন্তু আমরা যদি বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার পূর্ণ করে ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে রাখি, আর আমাদের কুরবানীকারী প্রিয়জনদের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে নিজেদের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি করে যেতে থাকি তাহলে নিশ্চিত আমরা আল্লাহ্ তাআলার আশীষসমূহের উত্তরাধিকারী হবো। এই শান্তনাও আমাদেরকে খোদা তাআলাই দিয়েছেন, আন্তরিকতার সাথে যারা পুণ্য করে খোদা তাআলা তাদেরকে পুরস্কার দেন।

আমাদের মধ্যে থেকে যারা কুরবানী করেছে তাদের কুরবানীকে আল্লাহ্ তাআলা এভাবে কবুল করেছেন, আফ্রিকার দুরদুরান্ত জঙ্গল এবং মরুভুমি থেকে নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার আলোকিত শহরগুলোতে শুধু যে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছে তা-ই নয় বরং বয়আতের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আফ্রিকা দেশের একটি রিপোর্ট আমি দেখছিলাম, যেখানে গত বছর এক হাজার বয়আত হয়েছিল সেখানে শাহাদতের ঘটনার পর কয়েক মাসের মধ্যেই প্রায় পাঁচ হাজার বয়আত হয়েছে।

এভাবেই আমাদের একজন মুরব্বী মোবাল্লেগ সাহেব রিপোর্ট দিয়েছেন, এক জায়গায় গিয়েছিলাম সেখানে অনাবৃষ্টির/প্রচন্ড খরার কারনে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়েছিল এবং ফসলও নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। সেখানকার লোকজন ইস্‌তেসকার নামাযের জন্য বাহিরে বের হল। তখন আমি তাদের ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে পড়াবেন? এ হলো প্রকৃত পদ্ধতি/নিয়ম। তখন সে বলল, তাহলে আপনিই পড়ান। তিনি নামায পড়ালেন আর বললেন, সেই সময় আমার অবস্থা এমন হয়েছিল, আল্লাহ্ তাআলার রাস্তায় (এইতো কিছুদিনের কথা যখন লাহোরে দুর্ঘটনা ঘটেছিল) ৮৫/৮৬জন আহমদীগণ কুরবাণী দিয়েছেন।

আজকে তো এই নিদর্শন দেখাও, তাদের কুরবাণীকে গ্রহণ করে আমাদেরকে এখানে একটি বড় জামাত দান কর। অত:পর আল্লাহ্ তাআলা আশ্চর্যান্বিতভাবে এ নিদর্শন দেখালেন, প্রখর রোদ থেকে কিছুক্ষণ পরেই আকাশে মেঘ এল এবং বৃষ্টি হলো আর এ গ্রামে অর্থাৎ এ অঞ্চলে এ বিষয়টি ছড়িয়ে পড়লো, আহ্‌মদীদের দোয়ার বদৌলতে আমাদের ফসলে সজীবতা এসেছে। সেখানে এক হাজারেরও বেশি সংখ্যায় বয়আত হয়েছে। এ হলো নিদর্শন যা খোদা তাআলা দেখিয়েছেন।

এভাবে আরব দেশ থেকেও কিছু চিঠি আসছে, তাদের এদিকে মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ঘানাতে যে দুজন মুসলমান নেতা আছে তারা বয়আত করেছে যারা আগে বিরোধীতা করতো। এগুলো আল্লাহ্ তাআলা করছেন। তাদের হৃদয়কে ফিরাচ্ছেন। এটি এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে, আল্লাহ্ তাআলা এ সকল কুরবানীকে গ্রহণ করেছেন যার বাহ্যিক নিদর্শনও প্রকাশ পাচ্ছে। আহ্‌মদীয়াত কোন আঞ্চলিক ধর্ম নয় বরং এটাতো ইসলামের প্রকৃত ছবি এবং ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম যাকে আল্ল? াহ্ তাআলা জগতে বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সুতরাং পাকিস্তান অথবা কিছু মুসলমান দেশগুলোর বিরোধীতা কি এ আন্তর্জাতিক বাণীকে বাধা দিতে পারে? এটি বিরোধীদের ভ্রান্ত ধারনা। বরং মুসলমান দেশগুলোতেও আহ্‌মদীয়াতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এটি এজন্য, এখানে মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আ.) এর স্বত্ত্বার প্রশ্ন নয় বরং আঁ-হযরত (সা.) এর সাথে খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি যা জগতের কোন শক্তি এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। আজ এ পুরো বিশ্বে শুধু একটি জামাতই রয়েছে যা মসীহ্ মাহ্‌দীর দাসদের জামাত। যারা খোদার প্রতিশ্রুতি এবং তকদীরের অংশ হয়ে ইসলামের বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করছে। এ হলো ঘটনা/বিষয়। বিষয়টি তো পূর্বেই বর্ণনা করেছি। তাই এখন এ বিষয়টি আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

যাই হোক এটা কেবলমাত্র আহমদীয়া জামাতই যারা আঁ হযরত (সা.) এর এই সংবাদ পৌঁছাচ্ছে। এর জন্য আহমদীদের যে ত্যাগ সমূহ, তা নতুন নতুন পথ দেখাচ্ছে এবং উম্মোচন করছে। সুতরাং এই স্পৃহা যা আঁ হযরত (সা.) প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা হচ্ছে এই মহান কুরবানী যা তিনি আমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। এটা আজ মুহাম্মদী মসীহ্ ও তাঁর দাসদের প্রত্যেক জাতির আহমদী মুসলমানদের মাঝে একটি নিদর্শনরূপে প্রকাশ হতে দেখা যাচ্ছে।

পাকিস্তানের আহমদী হোক বা হিন্দুস্তানের আহ্‌মদী অথবা বাংলাদেশের আহমদী বা ইন্দোনেশীয়ার আহমদী অথবা কোন আফ্রিকান দেশের বা আরব দেশের আহমদী নিজেদের কুরবানীর উন্নত মানদন্ডের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আরম্ভ করেছেন। যেন ইসলাম ও আহমদীয়াতের পতাকা দ্রুত পৃথিবীতে উড়তে দেখে।

আল্লাহ্ করুন এই ঈদ যেন আমাদের প্রিয়গনের কুরবানীসমূহকে সর্বদা স্মরণ করাতে থাকেন। আর আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত যেন শান্তিতে না বসি যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর পতাকা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত করে প্রেম-প্রীতি, ধৈর্য ও বিশ্বস্ততা এবং আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতকারী পৃথিবীতে অধিক সংখ্যায় না দেখি। আর যখন এরূপ হবে তখনই কেবল আমাদের কুরবানী সমূহের কবুলিয়াতের প্রকৃত ঈদ হবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এই শক্তি সামর্থ্য দান করুন।

খুতবা সানীয়ার পরে হুযূর আনোয়ার বলেন, এখন আমরা দোয়া করব। দোয়ায় শহীদগনের পরিবার পরিজনগণকে স্মরণ রাখবেন। মোবাল্লেগ সিলসিলাগণকেও স্মরণ রাখবেন। ঐসকল কুরবানীকারীগণকেও স্মরণ রাখুন যারা যেভাবেই জামাতের জন্য কুরবানী করছেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য এ ঈদকে সর্বদিক থেকে কল্যানমন্ডিত করুন। আমাদের দূর্বল চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করে আমাদেরকে দ্রুত বিজয় ও সাহায্যের দৃশ্য দেখান। সেই সাথে আমি আপনাদের সবাইকে ঈদ মোবারক জানাচ্ছি। অত:পর সমস্ত পৃথিবীর আহমদীদেরকেও **ঈদ মোবারক**।

আল্লাহ্ তাআলা এই ঈদ প্রত্যেক আহমদীর জন্য সর্বদিক থেকে কল্যানমন্ডিত করুন। দোয়ায় শামিল হোন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত)